যেখানে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত নীতি নির্দেশিকতাই অর্থ ব্যবস্থা পরিচালনার সর্বোচ্চ আধার ছিল। যার অর্থ ছিল যে, অর্থ ব্যবস্থার অত্যাবশ্যক শিল্পক্ষেত্রগুলো সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বেসরকারি ক্ষেত্রের শিল্পনীতিগুলো সরকারি ক্ষেত্রের পরিপূরক হবে, তবে শিল্প বিকাশে সরকারি ক্ষেত্রই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির সিদ্ধান্তসমূহ (IPR 1956) :

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ভারী এবং অত্যাবশ্যকীয় শিল্পক্ষেত্রের লক্ষ্যকে ভিত্তি করেই 1956 সালের শিল্পনীতির সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছিল. এই সিদ্ধান্তটিই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিত্তি প্রস্তর রচনা করেছিলো। এই পরিকল্পনাতে ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই নীতি বা সিদ্ধান্তে ভারতের শিল্পক্ষেত্রকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমভাগে, ঐ সমস্ত শিল্পক্ষেত্রকে রাখা হয় যেগুলো সম্পূর্ণভাবে সরকারি মালিকানায় থাকবে। দ্বিতীয় ভাগে, ঐ সমস্ত শিল্পকে রাখা হয়েছিল, যেখানে সরকারি ক্ষেত্রের সাথে বেসরকারি ক্ষেত্রও পরিপূরকভাবে কাজ করতে পারে। তবে নতুন শিল্প ইউনিট শুরু করার দায়িত্ব একমাত্র সরকারের উপর থাকবে। বাদবাকি শিল্পক্ষেত্রগুলো তৃতীয় ভাগে থাকবে, যেখানে বেসরকারি ক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবে কর্মকান্ড করতে পারবে।

যদিও বেসরকারি ক্ষেত্রের পরিচালনায় শিল্পের একটি ভাগকে রাখা হয়েছিল। তবে এই ক্ষেত্রটিও সরকার নিয়ন্ত্রিত লাইসেন্স পদ্ধতির অধীনে ছিল। সরকরের কাছ থেকে লাইসেন্স না নিয়ে কোনো নতুন শিল্প বা কারখানা এক্ষেত্রে কাজ করার অনুমতি ছিল না। দেশের পিছিয়ে পরা অঞ্চলগুলোতে শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করার জন্য এই নীতিটি ব্যবহার করা হয়েছিল। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোতে শিল্প স্থাপন করার জন্য খুব সহজেই লাইসেন্স পাওয়া যেত। এরসাথে এই শিল্প এককগুলোকে কিছু বিশেষ ছাড় প্রদান করা হতো। যেমন— কর সংক্রান্ত সুবিধা এবং কম মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক সমতাকে উন্নত করা।

এমনকি বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন স্তর বাড়ানোর জন্য বা উৎপাদনের বৈচিত্র্যকরণের জন্যও লাইসেন্সের প্রয়োজন ছিল (নতুন ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে)। অর্থ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় উৎপাদনের তুলনায় যাতে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ অধিক না হয়, তা নিশ্চিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কেবলমাত্র তখনই লাইসেন্স প্রদান করা হত যখন সরকার সুনিশ্চিত হতো যে, অর্থ ব্যবস্থায় অধিক পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প : 1955 সালের গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কমিটি, যাকে 'কার্ভে কমিটিও' বলা হয়, গ্রামোন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র শিল্পকে ব্যবহার করার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে। একটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংজ্ঞা মূলত কোনো শিল্প এককের সম্পদের উপর অনুমোদিত সর্বোচ্চ বিনিয়োগের ভিত্তিতে করা হয়। সময়ের সাথে সাথে এই ঊর্ধ্বসীমাও পরিবর্তিত হয়েছে। 1950 সালে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলতে বুঝাতো যেখানে সর্বাধিক পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। বর্তমানে তা সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা বিনিয়োগের অনুমোদন পেয়েছে।

এটি মনে করা হয় যে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলো অধিক 'শ্রমনিবিড়' অর্থাৎ বৃহদাকার শিল্পের তুলনায় এই সমস্ত ক্ষেত্রে অধিক শ্রমিক ব্যবহার করা হয়। তাই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে অধিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সমস্ত শিল্পগুলো বৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা

করতে পারে না। তাই নিশ্চিতভাবে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য তাদেরকে বৃহৎ শিল্পের হাত থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এই সমস্ত শিল্প সংস্থাগুলোর উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে সংরক্ষণের শর্ত আরোপ করা হতো। তাছাড়া তাদের অনেক ধরনের ছাড় প্রদান করা হতো, যেমন স্বল্প আবগারি বা অন্তঃশুল্ক এবং স্বল্প সুদে ব্যাংকের ঋণ প্রদান করা।

2.5 বাণিজ্যনীতি : আমদানির বিকল্প

আমাদের গৃহীত শিল্পনীতির সাথে বাণিজ্যনীতি খুব নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিল। প্রথম সাতটি পরিকল্পনায়, বাণিজ্যের যেরকম বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গিয়েছে, তা থেকে একে অন্তর্মুখী বাণিজ্য কৌশল বলা যেতে পারে। প্রায়োগিকভাবে এই কৌশলকে 'আমদানির বিকল্প' বলা হয়। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল, দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে আমদানিকৃত দ্রব্যের পরিবর্ত তৈরি করা। যেমন - বিদেশে নির্মিত গাড়ি আমদানির পরিবর্তে ভারতে নিজস্বভাবে এই সমস্ত গাড়ি উৎপাদনের জন্য শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত করা হতো। এই নীতির মাধ্যমে সরকার দেশীয় শিল্পকে বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করেছিল। দুটি উপায়ে আমদানি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রদান কার হয়— বাণিজ্য শুল্ক এবং কোটা। বাণিজ্য শুল্ক হল আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর 'কর'। বাণিজ্য শুল্ক আরোপের ফলে আমদানিকৃত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং ওইসব দ্রব্যের ব্যবহারে মানুষকে অনাগ্রহী করে তুলে। আবার 'কোটা'র দ্বারা আমদানিকৃত দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। বাণিজ্য শুল্ক এবং কোটার প্রয়োগের ফল এই যে, তা আমদানির পরিমাণকে সীমিত করে এবং এভাবে দেশীয় শিল্প কারখানাগুলোকে বিদেশী প্রতিযোগিতায় হাত থেকে রক্ষা করে।

সংরক্ষণের নীতিটি এই ধারনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো খুব উন্নত অর্থব্যবস্থার উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর সাথে প্রতিযোগিতা করার মতো অবস্থায় নেই। এটা মনে করা হয়েছে যে, যদি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংরক্ষণ প্রদান কার হয় তবে কালক্রমে তারাও প্রতিযোগিতার কৌশল শিখবে। আমাদের নীতি প্রণেতাদেরও আশঙ্কা ছিল যে, যদি আমদানির উপর বিধিনিষেধ আরোপ না করা হয়, তবে সম্ভবত বিলাসবহুল দ্রব্যের আমদানির জন্য বিদেশি মুদ্রার খরচ বেড়ে যাবে। অথচ 1940-এর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রপ্তানি বৃদ্ধির জন্যও তেমন কোনোও গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা ছিল না।

শিল্প উন্নয়নের উপর বিভিন্ন নীতির প্রভাব : প্রকৃতপক্ষে, প্রথম সাতটি পরিকল্পনার সময়কালে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে প্রশংসাজনক সাফল্য এসেছে। এই সময়ে GDP-তে শিল্পক্ষেত্রের আনুপাতিক অবদান বৃদ্ধি পেয়েছিল যা 1950 সালে 11.8 শতাংশ থেকে 1990-91 সালে 24.5 শতাংশ হয়েছিল। GDP-তে শিল্পক্ষেত্রের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পাওয়া হল উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এই সময়ে শিল্প ক্ষেত্রের বার্ষিক ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয়। এখন আর ভারতীয় শিল্পক্ষেত্র কেবলমাত্র সুতি বস্ত্রশিল্প এবং পাটশিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। বাস্তবে, 1990 সালের মধ্যেই, বিশেষত সরকারি ক্ষেত্রের অবদানের কারণে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্র খুবই বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছিল। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার এমন বহু মানুষকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছিল যাদের বৃহৎ শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধন ছিল না, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা থেকে সুরক্ষা, ইলেকট্রনিক এবং অটোমোবাইল ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পথকে সুগম করেছিল অন্যথায় তা সম্ভব হত না।

ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থার বিকাশে সরকারি ক্ষেত্রের

কাজগুলো কর

- নিম্নোক্ত সারণির উপর ভিত্তি করে GDP তে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবদানের একটি পাই চিত্র গঠন করো এবং 1950 থেকে 1991 সালের মধ্যে উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোর অবদানের মধ্যে সৃষ্ট পার্থক্যের বিষয়ে আলোচনা করো।

ক্ষেত্রসমূহ		1950-51	1990-91
কৃষিক্ষেত্র	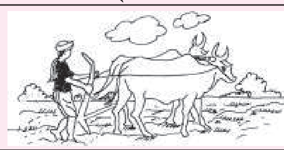	59.0	34.9
শিল্পক্ষেত্র	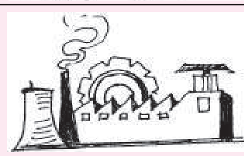	13.0	24.6
সেবাক্ষেত্র		28.0	40.5

- শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের দুটি দলে বিভক্ত করে, সরকার অধিগৃহীত সংস্থার উপকারিতা সম্পর্কে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করো। একদল ছাত্রছাত্রী সরকার অধিগৃহীত সংস্থার পক্ষে বক্তব্য রাখবে এবং অন্য দলটি এর বিপক্ষে বক্তব্য রাখবে। (যত বেশি সম্ভব ছাত্রছাত্রীদের এখানে অংশগ্রহণ করান এবং তাদের উদাহরণ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন।)

উল্লেখযোগ্য অবদান সত্ত্বেও কিছু অর্থনীতিবিদ্ অনেক সরকারি উদ্যোগের কর্মদক্ষতার সমালোচনা করেছেন। প্রাথমিকভাবে, সরকারি ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা খুব অধিক ছিল যা এই অধ্যায়ের শুরুতে উদ্বৃত্ত করা হয়েছে। এখন, এটা বহুলাংশে স্বীকৃত যে, সরকারি উদ্যোগগুলো এমন কিছু পণ্য এবং সেবাকার্যের উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে, যেগুলোর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই (প্রায়শই তাদের একচেটিয়াকরণের মাধ্যমে)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, টেলিযোগাযোগ সেবার সংস্থান। বেসরকারি ক্ষেত্রে এই সেবা প্রদান করতে পারে, এটা বোঝার পরেও এই শিল্প ক্ষেত্রটি এখনও সরকারি ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতির কারণে, 90-এর দশকের শেষের দিকেও একটি টেলিফোন সংযোগ পাওয়ার জন্য একজন মানুষকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। অন্য একটি উদাহরণ হল 'মডার্ন ব্রেড'-এর প্রতিষ্ঠা। যা ছিল একটি পাউরুটি উৎপাদন সংস্থা এমনটা মনে হয় যেন বেসরকারি ক্ষেত্র পাউরুটি উৎপাদন করতে পারে না। 2001 সালে এই সংস্থাটি বেসরকারি ক্ষেত্রের কাছে বিক্রি করা হলো। প্রকৃত বিষয় হল যে, ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থায় চার দশকের পরিকল্পিত উন্নয়নের পরেও কিছু কিছু বিষয়ে পার্থক্য করা হয়নি। যেমন — (ক) সরকারি ক্ষেত্র স্বতন্ত্রভাবে কি করতে পারে, (খ) বেসরকারি ক্ষেত্রও

কী করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র সরকারি ক্ষেত্রই জাতীয় সুরক্ষা প্রদান করেছে। যদিও বেসরকারি ক্ষেত্র খুব ভালোভাবেই হোটেল শিল্প পরিচালনা করতে পারে, তবুও সরকারি ক্ষেত্র নিজস্ব হোটেল পরিচালনা করছে।

এইসমস্ত বিষয়ের জন্যই কিছু বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, যে সমস্ত উৎপাদনক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্র পরিচালনা চলতে পারে, সেখান থেকে সরকারকে সরে দাঁড়ানো উচিত এবং সরকার সেইসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবাক্ষেত্রে তার সম্পদের প্রয়োগ করতে পারে যা বেসরকারিক্ষেত্র করতে পারে না।

অনেক সরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলো বিপুল পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু তারপরও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের সীমিত সম্পদ ক্রমাগত নিঃশোষিত হলেও সরকারি উদ্যোগ বন্ধ করা কঠিন। এর অর্থ এই নয় যে, সবসময় বেসরকারি ক্ষেত্র মুনাফায় চলছে (এমনকি বর্তমানের অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রকৃত পক্ষে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছিলো যেগুলো লোকসানের ফলে বন্ধ হতে চলছিল। তখন কর্মচারীদের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য এদের জাতীয়করণ করা হয়। তবে লোকসানে চলা কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কখনো লোকসানের মধ্যে কাজ চালিয়ে গিয়ে সম্পদের অপচয় করবে না।

কোন শিল্প শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্সটিকে অনেক বাণিজ্যিক গোষ্ঠী অপব্যবহার করেছিল। কোন বড় উদ্যোগপতি নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করার জন্য লাইসেন্স নিতো না। প্রকৃতপক্ষে তারা লাইসেন্স নিতো প্রতিযোগীরা যাতে নতুন উদ্যোগ শুরু করতে না পারে তা আটকানোর জন্য। অত্যধিক নিয়মনীতির বেড়াজাল থাকায় তাকে পারমিট লাইসেন্স রাজ বলা হতো। যা কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠনের কর্মদক্ষতার বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। তাদের পণ্যগুলো কীভাবে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করার পরিবর্তে শিল্পপতিদের লাইসেন্স পাওয়ার জন্য বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে 'লবি' (Lobby) তৈরি করার চেষ্টায় অধিক সময় ব্যয় করত। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা থেকে সংরক্ষণ প্রদানের বিষয়টিও সমালোচিত হচ্ছিল, কারণ এর প্রয়োগের ফলে লাভের তুলনায় অধিক ক্ষতি হচ্ছে তা প্রমাণিত হওয়ার পরও এটি চালিয়ে রাখা হচ্ছিল। আমদানিতে বিধিনিষেধ থাকার কারণে, ভারতীয় উৎপাদকরা যা উৎপাদন করত ভোক্তারা তা ক্রয় করতে বাধ্য হতো। উৎপাদকরা সচেতন ছিল যে তাদের কাছে একটি নিশ্চিত বাঁধাধরা (Captive) বাজার আছে। তাই তারা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগতমান বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হতো না। যখন তারা নিম্নমানের দ্রব্য বেশি দামে বিক্রি করতে পারে, তখন দ্রব্যের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য তারা চিন্তাভাবনা করবে কেন? আমদানিকৃত দ্রব্যের সাথে প্রতিযোগিতার ফলে আমাদের উৎপাদকেরা আরো বেশি দক্ষ হতে বাধ্য থাকবে।

কিছু অর্থনীতিবিদ এই মতবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, সরকারি ক্ষেত্র মুনাফা অর্জনের জন্য নয়, বরং দেশের কল্যাণের জন্য করা হয়। এইদিক থেকে বিচার করলে সরকারি ক্ষেত্রের মূল্যায়ণ তাদের অর্জিত মুনাফার ভিত্তিতে না করে জনকল্যাণে তার কতটুকু অবদান রয়েছে তার ভিত্তিতে করা উচিত। সংরক্ষণ সম্পর্কে কিছু অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য হল যে, বিদেশি প্রতিযোগিতা থেকে আমাদের উৎপাদকদের ততক্ষণ পর্যন্ত সংরক্ষণ প্রদান করা উচিত যতক্ষণ বিদেশি, সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলো তা করছে এই সমস্ত দ্বন্দের কারণেই অর্থনীতিবিদরা আমাদের নীতির পরিবর্তন চেয়েছেন। অন্যান্য সমস্যার সাথে এই বিষয়টিও, 1991 সালে সরকারকে নতুন আর্থিক নীতি প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

2.6 উপসংহার

প্রকৃতপক্ষে, প্রথম সাতটি পরিকল্পনাকালে, ভারতের অর্থ ব্যবস্থার উন্নতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে পরিস্থিতির তুলনায় আমাদের শিল্পক্ষেত্র অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। সবুজ বিপ্লবের কল্যাণে ভারত খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংভর হয়ে উঠেছে। ভূমি সংস্কারের ফলে ঘৃণ্য জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে। তবে, বহু সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের কর্মদক্ষতার সম্পর্কে অনেক অর্থনীতিবিদরা অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। সরকারের অতিরিক্ত নিয়মনীতির বিধিনিষেধ উদ্যোগিক বিকাশকে ব্যাহত করেছিল। স্বনির্ভরতা গড়ার নামে তাদের বিদেশি প্রতিযোগিতা থেকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল। যা তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধিতে কোনরকম উৎসাহ প্রদান করেনি। আমাদের নীতিগুলো ছিল ‘অন্তর্মুখী দিশায়’ এবং তাই আমরা মজবুত রপ্তানি ক্ষেত্র গঠন করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। পরিবর্তিত বিশ্ব-অর্থব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আর্থিক নীতিগুলোকে পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এবং তাই আমাদের অর্থ ব্যবস্থাকে আরো দক্ষ করার জন্য 1991 সালে ‘নতুন আর্থিক নীতি’ গৃহীত হয়। এটাই হল পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু।

সংক্ষিপ্ত বৃত্তি

- স্বাধীনতার পরে, ভারত এমন একটি অর্থব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিল যেখানে সামাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোর সম্মিলন ঘটবে। যার ফলশ্রুতিতে মিশ্র অর্থব্যবস্থার মডেলের স্বরূপ তৈরি হয়েছিল।
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমেই সমস্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গঠিত হয়েছিল।
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো হল — বিকাশ, আধুনিকীকরণ, স্বয়ংভরতা এবং সাম্যতা।
- কৃষিক্ষেত্রের প্রধান নীতি এবং উদ্যোগগুলো ছিল ভূমিসংস্কার এবং সবুজ বিপ্লব। এই সমস্ত উদ্যোগগুলো ভারতকে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সহায়তা করেছিল।
- কৃষিক্ষেত্রে নির্ভরশীল জনগণের অনুপাত আশানুরূপভাবে হ্রাস পায়নি।
- শিল্পক্ষেত্রে গৃহীত নীতি-উদ্যোগের ফলে GDP-তে এর (শিল্পের) অবদান বৃদ্ধি পেয়েছিল।
- শিল্পক্ষেত্রের একটি প্রধান ত্রুটি ছিল সরকারি ক্ষেত্রের অদক্ষ কার্য পরিচালনা। কারণ এই ক্ষেত্রটি ক্রমশ লোকসানে চলতে শুরু করেছিল। যার কারণে দেশের সীমিত সম্পদগুলো নিঃশেষ হচ্ছিল।

বর্তমান পৃথিবীতে এই বিষয়ে সর্বসম্মতি রয়েছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নই সব নয় এবং জিডিপি সমাজের প্রগতির মাপক নয়।

— কে আর নারায়ণন

3.1 ভূমিকা

পূর্বতন অধ্যায়ে আমরা পাঠ করেছি যে, স্বাধীনতার পর থেকে ভারত মিশ্র অর্থনীতির কাঠামো অনুসরণ করছে। ওই কাঠামোয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুফলগুলোকে সমন্বিত করা সম্ভবপর হয়েছিল। কিছু বিদ্বানের মতে, এই মিশ্র অর্থনীতির সুবাদে বহু ধরনের বিধি-নিয়ম স্থাপিত হয় এবং যদিও ওই সকল বিধি ও নিয়মগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু কার্যত এর ফলে বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যহত হচ্ছিল। আরেক অংশের বিদ্বানদের বক্তব্য হল, ভারত প্রায় বন্ধ্যাবস্থা থেকে উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু করে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী বহুমুখী শিল্পক্ষেত্রর উদ্ভব ও কৃষি উৎপাদনের ধারাবাহিক প্রসারণ যার ফলে খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত হয়। অর্থনীতির এই ক্ষেত্রগুলোতে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল ভারত।

1991 সালে বিদেশি ঋণের ক্ষেত্রে ভারত অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয় কেন না সরকার বিদেশ থেকে নেওয়া ঋণ মেটাতে পারছিল না। পেট্রোল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী আমদানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় — এমনভাবে হ্রাস পায় যে এক পক্ষ চলার মতো বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় ছিল না। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ঊর্ধ্বমুখী দাম সংকটকে জটিল করে তুলে। সব কিছুর পরিণতিতে সরকার নতুন ধরনের নীতিমালা প্রবর্তন করে এবং নয়া নীতিমালা আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচির গতিমুখে পরিবর্তন আনে। এই অধ্যায়ে আমরা সংকটের প্রেক্ষাপট এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাসমূহের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব।

3.2 পটভূমি

অর্থনৈতিক সংকটের উৎসে ছিল 1980-র দশকে ভারতীয় অর্থনীতির অদক্ষ ব্যবস্থাপনা। এটা আমাদের জানা রয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের নীতি কার্যকর করার জন্য এবং সাধারণ প্রশাসন পরিচালনার জন্য সরকারকে কর আরোপ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র পরিচালনাসহ নানাবিধ ক্ষেত্র থেকে সম্পদ আরোহণ করতে হয়। যখন আয়ের চাইতে ব্যয় বেশি হয় তখন সরকার খরচ জোগানোর জন্য ব্যাংক থেকে, দেশের মানুষ থেকে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করে। যখন আমরা পেট্রোল জাতীয় সামগ্রী আমদানি করি তখন আমরা রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত ডলার দিয়ে পেট্রোলের দাম মেটাই। উন্নয়নের কর্মসূচি প্রয়োজনে রাজস্বের অতি নিম্ন অবস্থা সত্ত্বেও বেকারি দারিদ্রতা ও জনবিস্ফোরণ -এর মতো চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য সরকারকে রাজস্বের অতিরিক্ত খরচ করতে হয়। উন্নয়নের কর্মসূচির জন্য সরকারের ধারাবাহিক ব্যয়ের ফলে অতিরিক্ত রাজস্ব সৃষ্টি হয় না।

সরকার অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ যেমন কর থেকে প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারে না। যখন সরকারকে তার আয়ের একটা বিরাট অংশ সামাজিক ক্ষেত্র ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আশু ফল লাভের সম্ভাবনা ছাড়াই ব্যয় করতে হয় তখন বাকি রাজস্ব অত্যন্ত দক্ষভাবে ব্যবহার করতে হয়। ক্রমবর্ধমান ব্যয় মেটানোর জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র থেকে আয়ও যথেষ্ট ছিল না। অনেক সময় বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ঋণ করে নেওয়া বিদেশি মুদ্রা ভোগব্যয় মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হত। লাগামছাড়া খরচ নিয়ন্ত্রণে কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। একইভাবে ক্রমবর্ধমান আমদানি খরচ মেটানোর জন্য রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি।

আশির দশকের শেষ দিকে সরকারি ব্যয় রাজস্ব অতিরিক্ত এতটা হয়ে যায় যে ঋণ করে খরচ মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম অসম্ভব বেড়ে যায়। আমদানি উচ্চহারে বৃদ্ধি পায় এবং আমদানির সাথে রপ্তানির সামঞ্জস্য থাকে না। ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় এতটাই কমে যায় যে দুই সপ্তাহের জন্য আমদানি খরচ মেটানোও কঠিন হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের সুদ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় ছিল না এবং একই সাথে কোনো দেশ অথবা বিদেশি ঋণ দাতা সংস্থা ভারতকে ঋণ দিতে প্রস্তুত ছিল না। ভারত আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক যাকে বিশ্বব্যাংক বলে সাধারণভাবে অভিহিত করা হয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বা আই এম এফের কাছে ঋণের জন্য দ্বারস্থ হয় এবং সংকট মোকাবেলার জন্য সাত বিলিয়ন ডলার ঋণ পায়। ওই ঋণ গ্রহণের জন্য ওইসব আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ভারতের কাছে প্রত্যাশা রাখে বেসরকারি ক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা লঘু করে এবং ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে বাণিজ্য বিধিনিষেধ সরিয়ে অর্থনীতিকে উদার ও মুক্ত করা। ভারত বিশ্বব্যাংক ও আই এম এফের শর্ত মেনে নেয় এবং নয়া অর্থনৈতিক নীতি বা এন ই পি ঘোষণা করে। এন ই পি বহুধা বিস্তৃত অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচি। এন ই পি-এর মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়ার সৃষ্টি করা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ দূর করা। এই ধরনের নীতিগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। স্থিতিশীলতা আনয়নকারী ব্যবস্থা এবং কাঠামোগত সংস্কার ব্যবস্থা। স্থিতিশীলতা আনয়নকারী ব্যবস্থাগুলো স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা যা মূলত লেনদেন উদ্বৃত্ত জনিত দুর্বলতা দূর করা এবং মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। সহজ কথায় এর অর্থ দাঁড়ায় পর্যাপ্ত বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় রক্ষা করা এবং ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনা। অন্যদিকে কাঠামোগত সংস্কার ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া যার মূল লক্ষ্য অর্থনীতিতে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতা সক্ষম করে তোলা ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনমনীয়তাকে দূর করে। সরকার বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি প্রবর্তন করে এবং এই কর্মসূচিগুলো মূলত তিনটিভাগে পড়ে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন।

3.3 উদারীকরণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সৃষ্ট আইন ও বিধিনিয়মগুলো বৃদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একসময় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। উদারীকরণের প্রবর্তন করা হয় এই নিয়ত্রণগুলোকে দূর করার জন্য এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র মুক্ত করার জন্য। যদিও 1980র দশকে কিছু উদারীকরণ ব্যবস্থা

যেমন শিল্প লাইসেন্স, আমদানি-রপ্তানি, প্রযুক্তি উন্নতিকরণ, আর্থিক নীতি, বিদেশি বিনিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেয়া হয়েছিল কিন্তু 1991এ প্রবর্তিত উদারীকরণ ব্যবস্থাগুলো অনেক বেশি সর্বাত্মক ছিল। আমরা এখন অধ্যায়ন করব কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেমন শিল্পক্ষেত্র, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, করসংস্কার, বিদেশি মুদ্রা বাজার, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রগুলো যেগুলো 1991 ও পরবর্তী সময়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল।

শিল্পক্ষেত্রের বিনিয়ন্ত্রণ :

ভারতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ বিভিন্নভাবে কার্যকর করা হয়েছিল যেমন i) শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থার যার অধীনে সরকারি আমলাদের কাছ থেকে প্রত্যেক উদ্যাগপতিকে উদ্যোগ স্থাপনের জন্য, উদ্যোগ বন্ধ করার জন্য অথবা কী পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করা হবে তার জন্য অনুমতি নিতে হত। ii) অনেক শিল্পেই বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ছিল না। iii) কিছু পণ্য শুধুমাত্র ক্ষুদ্র শিল্পেই উৎপাদন করা যেত। iv) মূল্য নির্ধারণ এবং বাছাই করা শিল্প সামগ্রী বিতরণের উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

1991 ও পরবর্তী সময়ে প্রবর্তিত সংস্কার কর্মসূচি এইসব নিয়ন্ত্রণ সমূহের অনেকটা দূর করে। অ্যালকোহল, সিগারেট, বিপজ্জনক রাসায়নিক, শিল্পজাত বিস্ফোরক, বিদ্যুৎ সরঞ্জাম, মহাকাশ ও ওষুধ এগুলো ছাড়া বাদবাকি পণ্যসামগ্রীর জন্য শিল্প লাইসেন্সিং তুলে দেওয়া হল। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য যেসব শিল্পসমূহকে সংরক্ষিত রাখা হল সেগুলো হল প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের একটি অংশ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও রেল পরিবহণ। ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রদ্বারা উৎপাদিত বহু সামগ্রী অসংরক্ষিত করা হল। অনেক শিল্পে দাম নির্ধারণ বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল।

আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কার :

আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, স্টক একচেঞ্জ ও বিদেশি মুদ্রা বিনিময় বাজারে সংস্কার। ভারতে আর্থিক ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তোমাদের জানা থাকার কথা যে, ভারতের সমস্ত ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো রিজার্ভ ব্যাংকের বিভিন্ন বিধি ও নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যাংক কতটা অর্থ রাখবে, সুদের হার কীভাবে নির্ধারণ করবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণপ্রদান কীভাবে ব্যাংক করবে ইত্যাদি রিজার্ভ ব্যাংক নির্ধারণ করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সংস্কার কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হল রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা নিয়ন্ত্রক থেকে সহায়তাকারীতে পরিণত করা। এর অর্থ হল রিজার্ভ ব্যাংকের সাথে পরামর্শ ছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ প্রদান করা। সংস্কার নীতির ফলে ভারতীয় এবং বিদেশীরা প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক স্থাপন করতে পারবে। ব্যাংকে বৈদেশিক বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে 50 শতাংশ করা হয়। যে সকল ব্যাংক কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করবে তারা ইচ্ছা করলে আর বি আই-এর অনুমোদন ব্যতিরকেই নতুন শাখা খোলার স্বাধীনতা পাবে। প্রয়োজনে এই ব্যাংকগুলোর মধ্যে বিরাজমান শাখা-অন্তজালকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিস্তার করতে পারবে। যদিও ব্যাংকগুলোকে দেশ ও বিদেশ থেকে সম্পদ সৃজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তথাপি পরিচালনগত কিছু বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাংকের তদারকি বজায় থাকবে।বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের (FII) যেমন, মার্চেন্ট ব্যাংকারস, মিউচুয়াল ফান্ডস এবং পেনশন ফান্ডসকে এখন ভারতের আর্থিক বাজারগুলোতে বিনিয়োগরে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কর ব্যবস্থায় সংস্কার :

কর ব্যবস্থার সংস্কারের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ হল সরকারের কর কাঠামোর সংস্কার এবং সরকারের ব্যয়নীতির সংস্কার, যাদেরকে সম্মিলিতভাবে ফিসক্যাল পলিসি বা রাজকোষনীতি বলা হয়। কর দুই ধরনের, যথা প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ কর। ব্যক্তিগত আয় এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করা হয়। 1991 সালের পর থেকে ব্যক্তিগত আয় করের হার ধারাবাহিকভাবে কমানো হয়েছে। আয় করের উচ্চহারের জন্য কর ফাঁকির পরিমাপ বাড়ছিল বলেই আয়করের হার কমানো হয়েছে।

এটা এখন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, আয়করের মাঝারি হার সঞ্চয়ে উৎসাহ যোগায় এবং স্বতঃ প্রণোদিতভাবে আয় প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করে। পূর্বে কর্পোরেট করের (কোম্পানির মুনাফার উপর আরোপিত কর) হারও খুব অধিক ছিল। এই হারও ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হচ্ছে। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রও সংস্কারের আওতায় আনা হয়েছে। পণ্য ও দ্রব্যের সাধারণ জাতীয় বাজার গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে প্রোৎসাহিত করার লক্ষ্যে পণ্যের উপর কর আরোপ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সংস্কারের আর একটা অভিমুখ হল কর ব্যবস্থার সরলীকরণ। কর দাতাদের সুবিধার্থে অনেক নিয়মনীতি সরল করা হয়েছে এবং কর হারও কমানো হয়েছে। ইদানীংকালে সংসদ একটা আইন পাশ করেছে। আইনটি হল Goods and Services Tax Act. 2016 (পণ্য দ্রব্য ও সেবা কর আইন 2016)। 2017 সালের জুলাই মাসে এই আইন কার্যকরী হয়। এই আইন ভারতে পরোক্ষ কর ব্যবস্থাকে সরলীকৃত করে এবং সারা দেশে এই কর হার চালু করে। এর ফলে এই প্রত্যাশা করা যায় যে, কর সংস্কারের এই কর্মসূচি কর ফাঁকি রোধ করে সরকারের কোষাগারে বাড়তি রাজস্ব জমা হতে সাহায্য করে এবং 'একজাতি, এক কর এবং এক বাজার' সৃষ্টি করবে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে সংস্কার :

বৈদেশিক ক্ষেত্রের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করা হয়েছিল বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে। 1991 সালে উদ্বৃত লেনদেন উদ্বৃত্তের সমস্যার সমাধানের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্কে টাকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল। এর প্রভাব দেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। এর সাথে সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ের বাজার থেকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ গুটিয়ে নেওয়া হয়। তাই এমন বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (উদাহরণ স্বরূপ ডলারের রূপীয় মুল্য) বাজারের চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে নির্ধারিত হয় যা সংস্কার পূর্ববর্তী সময়ে হত না।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতির সংস্কার :

বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল শিল্পের উৎপাদনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাপূর্ণ মানসিকতা বৃদ্ধি করতে। এছাড়াও অর্থনীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করতে। এক্ষেত্রে উদারীকরণের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। সেটা হল স্থানীয় শিল্পগুলো যাতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির পথ অবলম্বন করে। দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষিত রাখতে ভারতে এতদিন ধরে আমদানির পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু ছিল। আমদানির উপর কঠিন বিধিনিষেধ আরোপ করতে আমদানি শুল্কের হারও খুব বেশি করা হয়েছিল। এই নীতিগুলো উৎপাদন ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং প্রতিযোগিতামূলক ভাবনা কমিয়ে শিল্পে বৃদ্ধির হারকে শ্লথ করেছিল। বাণিজ্যনীতি সংস্কারের লক্ষ্যগুলো ছিল

— ক) আমদানি এবং রপ্তানি ক্ষেত্রে পরিমাণগত বাধাগুলোর হাত টানা, খ) শুল্ক হার কমানো এবং গ) আমদানি ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং প্রথা অবলুপ্ত করা।

আমদানি ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান কেবলমাত্র বিপদজনক এবং পরিবেশগত সংবেদনশীল শিল্পগুলো ছাড়া সব জায়গা থেকেই বিলোপ করা হয়েছিল। এপ্রিল, 2001 থেকে কৃষিজ উৎপাদন এবং উৎপাদনভোগ্য দ্রব্য চিরতরে অবলুপ্ত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় দ্রব্যকে প্রতিযোগী করে তুলতে রপ্তানি শুল্ক পরিহার করা হয়েছিল।

কাজগুলো করো

- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক, বেসরকারি বিদেশি ব্যাংক, FII এবং মিউচুয়াল ফান্ড — এর একটি করে উদাহরণ দাও।
- তোমার এলাকায় একটি ব্যাংকে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরিদর্শন করো। ব্যাংকের কার্যাবলিগুলো পর্যবেক্ষণ করো। এবিষয়ে তোমার সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং একটি চার্ট তৈরি করো।
- নিম্নের করগুলো পরোক্ষ কর না প্রত্যক্ষ কর বলো : বিক্রয় কর, অন্তঃশুল্ক, সম্পত্তি কর, মৃত্যু কর, ভ্যাট (VAT), আয় কর
- জানতে চেষ্টা করো তোমার পিতামাতা কর প্রদান করে কি? যদি হ্যাঁ হয়, তারা কীভাবে তা করে এবং কেন করে?
- তুমি কি জানো আগে দীর্ঘদিন ধরে অনেক দেশ রূপা ও সোনার তহবিল তৈরি করত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য? তুমি খোঁজ করো আমাদের দেশ 'বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়' কী রূপে জমা করে? খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে জানার চেষ্টা করো বর্তমানে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ভাণ্ডারে কত আছে? নিম্নেবর্ণিত দেশগুলোর মুদ্রার নাম এবং রুপির সাপেক্ষে বিনিময় হারগুলো বের করো —

দেশ	মুদ্রা	ভারতীয় টাকায় 1 ইউনিট বিদেশী মুদ্রার মূল্য
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র		
যুক্তরাজ্য		
জাপান		
চিন		
কোরিয়া		
সিঙ্গাপুর		
জার্মানি		

3.4 বেসরকারিকরণ

বেসরকারিকরণ বলতে বোঝায়, সরকারের মালিকানাধীন উদ্যোগগুলো বা সরকারি কোম্পানিগুলোর মালিকানা বা পরিচালনার দায়ভার থেকে সরকার হাত গুটিয়ে নেয় এবং বেসরকারি কোম্পানির হাতে তা তুলে দেয়। সরকারি কোম্পানির হাতে তা তুলে দেয়। সরকারি সংস্থাগুলোর বেসরকারিকরণ দুইভাগে করা হয় i) সরকারি ক্ষেত্রের কোম্পানিগুলোর মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনা থেকে সরকারের সরে দাঁড়ানো বা ii) সরকারি ক্ষেত্রের কোম্পানিগুলোকে সরাসরি বিক্রি করে দেওয়া।

সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগের বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় যখন পি এস ই-র শেয়ার বেসরকারি হাতে বিক্রি করে দেওয়া হয় তখন তাকে বিলগ্নিকরণ বা বি-বিনিয়োগ বলা হয়। সরকারের মতে, বি-বিনিয়োগ আর্থিক শৃঙ্খলাকে আঁটোসাটো করবে এবং আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াকে বেগবান করবে। এটা আশা করা হয়েছিল যে, বেসরকারি লগ্নি এবং পরিচালনাগত দক্ষতার সমন্বয়ে সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোর কর্মক্ষমতার উন্নতি করা সম্ভব হবে।

বাক্স 3.1 : নবরত্ন এবং সরকারি উদ্যোগের নীতিসমূহ

তুমি শৈশবকালে নিশ্চয়ই সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজ দরবারের নবরত্নদের বিষয়ে পড়েছ, যারা কলা, সাহিত্য এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিশ্বব্যাপী উদারীকরণের পরিবেশে সরকারি অধিকৃত সংস্থা (PSUs)গুলোর দক্ষতা বাড়াতে, পেশাদারি মনোভাব তৈরি করতে এবং তাদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াতে, সরকার কিছু PSE-কে চিহ্নিত করেছিল এবং তাদের মহারত্ন, নবরত্ন এবং মিনিরত্ন হিসাবে ঘোষণা করেছিল। কোম্পানিগুলোর দক্ষতা এবং মুনাফা বাড়াতে তাদের হাতে পরিচালনাগত এবং প্রক্রিয়াগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। লাভজনক উদ্যোগুলোকেও অধিক পরিচালন, আর্থিক এবং পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যাদের মিনিরত্ন বলা হত।

কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোকে বিভিন্ন পদমর্যাদা অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ :

i) মহারত্ন : a) Indian Oil Corporation Limited (IOC), b) Steel Authority of India Limited (SAIL), ii) নবরত্ন : (a) Hindustan Aeronautics Limited , (b) Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) ; iii) মিনিরত্ন : (a) Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL); (b) Airport Authority of India (AAI) এবং (c) Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited.

অনেক লাভজনক সরকার অধিকৃত সংস্থা (PSEs) স্থাপন প্রকৃতপক্ষে 1950 এবং 1960 এর দশকে হয়েছিল যখন সরকারি নীতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল আত্মনির্ভরশীলতা। এইগুলো স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল পরিকাঠামোর উন্নতি এবং প্রত্যক্ষ রোজগারের বৃদ্ধি ঘটানো, যাতে জনগণের কাছে উচ্চ গুণমানের সামগ্রী নামমাত্র দামে পৌঁছতে পারে। এইভাবে এই কোম্পানিগুলোকে সকল অংশীদারদের প্রতি দায়বদ্ধ করে তোলা হয়েছিল।

এই পদমর্যাদাগুলো কোম্পানিকে আরও ভালো কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। গবেষকদের মতে, সরকার ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোকে আরও বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তাদের বিশ্বমানের সংস্থা গড়ে তোলার পরিবর্তে সরকার বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে আংশিকভাবে বেসরকারিকরণের পক্ষে হাঁটছে। বর্তমানে সরকার তাদের সরকারি ক্ষেত্রে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তারা যাতে আর্থিক বাজার থেকে নিজেদের সম্পদ বাড়িয়ে বিশ্ববাজারের অঙ্গনে আরও এগিয়ে যেতে পারে।

কাজগুলো করো

- কিছু কিছু গবেষক বিলগ্নিকরণকে সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোর কর্মদক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বেসরকারি করণের বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপ নিতে বলছে। আবার কিছু গবেষক মনে করেন এটা হল কায়েমি স্বার্থে সরকারি সম্পত্তির নির্জলা বিক্রি মাত্র। তুমি কী মনে করো?
- খবরের কাগজ থেকে 10-15টি খবরের অংশ নিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করো — যে খবরগুলো নবরত্ন কোম্পানিগুলোর সঙ্গে জড়িত এবং তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই সরকারি উদ্যোগগুলোর বিজ্ঞাপন এবং লগোগুলো সংগ্রহ করো। একটি নোটিশ বোর্ডে তাদের সেঁটে দাও এবং শ্রেণিকক্ষে এনিয়ে আলোচনা করো।
- তুমি কি মনে করো ক্ষতির মুখ দেখছে এমন সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোকেই শুধু বেসরকারিকরণ করা প্রয়োজন? কেন?
- রুগ্ন সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোর বাড়তি বরাদ্দ সরকারি বাজেট থেকে করা উচিত। তুমি কি এই উক্তিটিকে সমর্থন করো? আলোচনা করো।

সরকার তাও আশা করেছিল বেসরকারিকরণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণকে বাড়ানো যাবে।

সরকার চেষ্টা করেছিল পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং বা পি এস ইউগুলোকে পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়েছিল যাতে তাদের দক্ষতার উন্নতি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু পি এস ইউকে মহারত্ন, নবরত্ন-এর বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল। (বাক্স 3.1 দেখো)

3.5 বিশ্বায়ন

সাধারণত বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় বিশ্ব অর্থনীতির সাথে দেশের অর্থনীতির সংযুক্তিকরণ। তবে বিশ্বায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। আসলে বিশ্বায়ন হল একাধিক নীতির প্রয়োগজনিত ফলাফল। বৃহত্তর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সংযুক্তির পথে পৃথিবীকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে গৃহীত একগুচ্ছ কর্মসূচির ফলাফল হচ্ছে বিশ্বায়ন। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রমকারী অন্তর্জাল তৎপরতা সৃষ্টি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বায়ন এমনভাবে সংযুক্তিকরণ ঘটায় যার ফলে বিশ্বের বহুমাইল দূরের ঘটনাবলি দ্বারা ভারতে কী ঘটছে তা প্রভাবিত হয়। বিশ্বায়ন পৃথিবীকে এক জায়গায় নিয়ে আসছে। অন্যভাবে বলা যায় সীমাহীন পৃথিবী সৃষ্টি করছে।

আউট সোর্সিং :

আউটসোর্সিং বিশ্বায়নের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের একটি। আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে একটি কোম্পানি নিয়মিতভাবে বাহ্যিক উৎসগুলো থেকে পরিসেবা গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাইরের দেশগুলো থেকে, কিন্তু আগে এই পরিষেবা দেশের অভ্যন্তরেই সম্পাদিত করা হতো (যেমন আইনি পরামর্শ, কম্পিউটার পরিষেবা, বিজ্ঞাপন, সুরক্ষা এই প্রতিটি উল্লেখিত বিভাগগুলো কোনো একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে পারতো দেশীয় পরিধির মধ্যে থেকেই)। সাম্প্রতিক সময়ে আউট সোর্সিং এর কর্মকাণ্ড অনেক বেশি তীব্রতর হয়েছে। কেন না এটি যোগাযোগের বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির একটি অন্যতম দ্রুততর মাধ্যম। পরিষেবাগুলির মধ্যে যেমন স্বর (voice) ভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া (BPO বা call centre হিসেবে বহুল পরিচিত), নথিভুক্তকরণ।

বাক্স 3.2 : বিশ্বব্যাপী পদচিহ্ন !

বিশ্বায়নের কারণে তোমার হয়তো মনে হতে পারে অনেকগুলো ভারতীয় কোম্পানি তাদের শাখাপ্রশাখা আরও অনেক দেশে বিস্তৃত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারত সরকারের অধিগৃহীত সহযোগী সংস্থা ONGC Videsh, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস নিগম (ONGC) - তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে 16টি দেশে প্রকল্পের মাধ্যমে নিয়োজিত রয়েছে। 1907 সালে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারি সংস্থা টাটা স্টিল, বিশ্বের শীর্ষ 10টি লৌহ-ইস্পাত কোম্পানিগুলোর মধ্যে অন্যতম যার কর্মকাণ্ড 26টি দেশে বিস্তৃত এবং 50টি দেশে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে। এটি অন্যান্য দেশে প্রায় 50,000 ব্যক্তির কর্মসংস্থান করে। ভারতে শীর্ষ পাঁচটি আই টি কোম্পানিগুলির মধ্যে HCL টেকনোলজিদের 31টি দেশে অফিস রয়েছে এবং বিদেশে প্রায় 15000 জন কর্মী রয়েছে। ডা. রেড্ডির ল্যাবরেটরিগুলো শুরুতে বড়ো কোম্পানিগুলোর কাছে ঔষধ প্রস্তুতিকরণের পণ্য সামগ্রী সরবরাহকারী একটি কোম্পানি ছিল, আজ এর বিশ্বব্যাপী উৎপাদন কেন্দ্র ও গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে।

উৎস : *www.rediff.com থেকে 14.10.2014 তারিখে নেওয়া।*

হিসাব রক্ষণ, ব্যাংকিং, পরিষেবা, সংগীত রেকর্ডিং, ফিল্ম এডিটিং, বই প্রতিলিপিকরণ, ক্লিনিক্যাল পরামর্শ বা এমনকি ভারতে শিক্ষাদানও উন্নত দেশের কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে আউটসোর্স হচ্ছে। ইন্টারনেটের সাথে আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন সংযোগগুলোর সাহায্যে টেক্সট, ভয়েস এবং ভিজ্যুয়াল এই সমস্ত ডিজিটালকৃত ডেটাগুলো বিভিন্ন মহাদেশ এবং জাতীয় সীমানাগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। বেশিরভাগ বহুজাতিক সংস্থা এবং ছোটো ছোটো কোম্পানিগুলো ভারতে তাদের পরিসেবাগুলোর আউটসোর্সিং করে, যেখানে তারা স্বল্প ব্যয়ে দক্ষতা এবং নির্ভুলতার ন্যায়সঙ্গত স্তরে পৌঁছে উপকৃত হতে পারে। ভারতে নিম্নমজুরি হার এবং সুদক্ষ লোকবলের প্রাপ্যতা সংস্কার পরবর্তী সময়ে ভারতকে বিশ্বব্যাপী আউটসোর্সিং এর একটি গন্তব্যস্থল করেছে।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) :

WTOটি 1995 সালে শুল্ক ও বাণিজ্য নিয়ে সাধারণ চুক্তি (গ্যাট)-র উত্তরাধিকারী সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্যাট 1948 সালে 25টি দেশের সাথে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে সকল দেশকে সমান সুযোগ প্রদান করতে প্রতিষ্ঠিত হয়। WTO প্রত্যাশিতভাবে একটি নিয়ন্ত্রিত শাসন দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে কোনো দেশই ব্যবসা বাণিজ্যে নিজের ইচ্ছেমতো বিধিনিষেধ

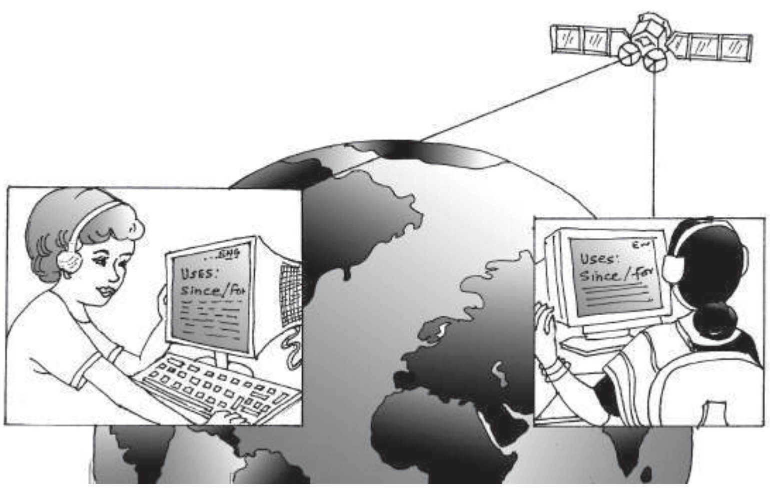

চিত্র 3.1 *: আউটসোর্সিং : বড়ো শহরে একটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ*

কাজগুলো করো

- ➢ অনেক বিশষজ্ঞরা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, বিশ্বায়ন হল প্রকৃতপক্ষে একটি হুমকি কারণ এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস পায়। আবার এর বিপরীতে অনেকে যুক্তি দিয়ে বলেন যে, এটা (বিশ্বায়ন) হল একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ যা প্রতিযোগিতা এবং অধিগ্রহণের জন্য বাজারকে উন্মুক্ত করে। শ্রেণিকক্ষে এই বিষয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।
- ➢ ভারতে (BPO) সেবা প্রদানে কর্মরত পাঁচটি কোম্পানির তালিকা তৈরি করো এবং তার পাশাপাশি তাদের বিক্রির পরিমাণও উল্লেখ করো।
- ➢ একটি দৈনিক সংবাদপত্র থেকে একটি সংবাদের বিষয় উদ্বৃত করা হয়েছে যা বর্তমানে ক্রমবর্ধমানভাবে ঘটে চলেছে নীচে এমন একটি অংশ তুলে ধরা হল — তোমরা পড়ো।

"একটি সকালে, 7টা বাজার কয়েক মিনিট আগে গ্রীষ্মা তার হেডসেট নিয়ে তার কম্পিউটারের সামনে বসে জোরালো ইংরেজিতে বলেছিল 'হ্যালো ড্যানিয়েলা'। কয়েক সেকেন্ড পরেই সে প্রত্যুত্তর পেল 'হ্যালো, গ্রীষ্মা'। তারা দুইজন খুব উৎফুল্লভাবে কথোপকথন করার পর গ্রীষ্মা বলল যে 'আজকে আমরা সর্বনাম বিষয়ে আলোচনা করব'। এই কথোপকথনে আশ্চর্য হওয়ার তেমন কিছু ছিল না। তবে 22 বছরের গ্রীষ্মা ছিল কোচিতে এবং তার 13 বছরের শিক্ষার্থী ড্যানিয়েলা ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত মালিবুতে তার ঘরে বসেছিল। ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত তাদের কম্পিউটারে একটি কৃত্রিম সাদাবোর্ড ব্যবহার করে এবং গ্রীস্মার সামনে ড্যানিয়েলার পাঠ্যবইয়ের একটি প্রতিলিপি রেখে তিনি কিশোরদের বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ক্রিয়ার জটিলতাগুলো বুঝতে সহায়তা করছিলেন। গ্রীষ্মা মালয়ালম ভাষা বলতে বলতেই বড়ো হয়েছেন। এখন তিনি ড্যানিয়েলাকে ইংরেজি ব্যাকরণ, কম্প্রিহেনসন এবং লেখার কৌশল শেখাছিলেন।"

  - ✓ এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছে? ড্যানিয়েলা নিজের দেশে এই শিক্ষা পেতে পারছিল না কেন? কেন সে ভারত থেকে ইংরেজির শিক্ষাগ্রহণ করছিল, সেখানের মাতৃভাষা ইংরেজি নয়?
  - ✓ ভারত বিশ্ববাজারের উদারীকরণ এবং একত্রীকরণের ফলে উপকৃত হচ্ছে। তুমি কি এই কথার সাথে একমত?
- ➢ কল সেন্টারের চাকরি কি স্থিতিশীল? কলসেন্টারে কর্মরত মানুষদের নিয়মিত আয় বজায় রাখতে হলে কী ধরনের দক্ষতা অর্জন করতে হবে?
- ➢ সস্তা শ্রমিক পাওয়ার কারণে যদি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ভারতের মতো দেশের সেবাকার্য গ্রহণ করতে থাকে, তবে যে সমস্ত দেশে এই কোম্পানিগুলো অবস্থিত রয়েছে, সেখানকার জনগণের কী হবে? আলোচনা করো।

আরোপ করতে পারে না। উপরন্তু তার উদ্দেশ্য হল উৎপাদন এবং সেবাকার্যের বাণিজ্য বৃদ্ধি করা, বিশ্বের সমগ্র সম্পদের উৎকৃষ্ঠতম ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করা এবং পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষা করা। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চুক্তিগুলোতে পণ্য বাণিজ্যের সাথে সাথে পরিষেবাগত ক্ষেত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে শুল্ক এমনকি শুল্কবিহীন বাধাগুলোকে দূর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সুবিধা প্রদান করা যায় এবং সমস্ত সদস্য দেশগুলোর কাছে বৃহত্তর বাজারের সুযোগ প্রদান করা যায়।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ভারত, সুষ্ঠু বিশ্ববিধি গঠন, নীতি প্রণয়ন এবং সুরক্ষা প্রদান এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থরক্ষার সমর্থনে সর্বদা সামনের সারিতে রয়েছে। আমদানি ক্ষেত্রে পরিমাণগত বিধিনিষেধ অপসারণ এবং শুল্ক হারের হ্রাস ঘটিয়ে, ভারত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় তৈরি বাণিজ্য উদারিকরণের প্রতি নিজের

সারণি 3.1

জি ডি পি'র এবং প্রধান ক্ষেত্রসমূহের প্রবৃদ্ধি (%)

ক্ষেত্র	*1980-91*	*1992-2001*	*2002-07*	*2007-12*	*2012-13*	*2013-14*	*2014-15*
কৃষি	3.6	3.3	2.3	3.2	1.5	4.2	– 0.2
শিল্প	7.1	6.5	9.4	7.4	3.6	5	5.9
পরিসেবা	6.7	8.2	7.8	10	8.1	7.8	10.3
মোট	**5.6**	**6.4**	**7.8**	**8.2**	**5.6**	**6.6**	**7.2**

উৎস : *অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2016-17, অর্থদপ্তর, ভারত সরকার।*

অঙ্গীকার রক্ষা করেছে।

কিছু বিশেষজ্ঞ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ভারতের সদস্যপদের সুফল প্রাপ্তি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন যেহেতু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অধিকাংশই সংগঠিত হয় উন্নত দেশগুলোর মধ্যে। তারা আরও বলেছে যে, যেখানে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশে কৃষিতে ভর্তুকি দেওয়ায় অভিযোগ করছে। সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলো মনে করে তারা উন্নত দেশের দ্বারা প্রতারিত হয়ে তাদের বাজার উন্মুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছে কিন্তু তারা উন্নত দেশগুলোর বাজারে প্রবেশ করতে পারছে না।

চিত্র 3.2 : *তথ্য প্রযুক্তি শিল্প হল ভারতের রপ্তানি ক্ষেত্রের প্রধান অবদানকারী।*

3.6 সংস্কারকালীন সময়ে ভারতের অর্থনীতি : একটি পর্যালোচনা

সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে দেড় দশক সময় অতিক্রম করেছিল। চলো এক নজরে দেখে নিই সংস্কারকালীন সময়ে ভারতীয় অর্থনীতির কার্যকারিতা কেমন ছিল। অর্থশাস্ত্রে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) মাধ্যমে একটি অর্থনীতির বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়। (সারণি 3.1 দেখো)। 1991 সালের পরবর্তী দুই দশক সময় ধরে ভারতের GDP-র ক্রমাগত দ্রুত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। 1980-91 সাল থেকে 2007-12 সালে GDP এর বৃদ্ধি 5.6 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 8.2 শতাংশ হয়েছে। সংস্কারকালীন সময়ে কৃষির বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে, যেখানে শিল্প ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে ওঠানামা পরিলক্ষিত হয় এবং পরিসেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। এটা দেখায় যে এই ধরনের বৃদ্ধি প্রধানত পরিসেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধির জন্যই সম্ভব হয়েছিল। 1991 সালের পরবর্তী সময় থেকে 2012-15 সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হারে অবনমন পরিলক্ষিত হয়। যেখানে 2013-14 সালে কৃষিক্ষেত্রের উচ্চ বৃদ্ধির হার নথিভুক্ত হয়, তবে পরবর্তী বছরেই কৃষিক্ষেত্রে নেতিবাচক বৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে পরিসেবা ক্ষেত্রে 2014-15 সালের সার্বিক GDP-র হার থেকেও সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত হয় এবং এই বৃদ্ধির হার ছিল 10.3 শতাংশ যা এখন পর্যন্ত সর্বাধিক। 2012-13 সাল পর্যন্ত শিল্পক্ষেত্রের বৃদ্ধির হারে দ্রুত হ্রাস পরিলক্ষিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে এই ক্ষেত্রের ক্রমাগত বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে।

অর্থনীতির দ্বারা উন্মুক্ত হওয়ার ফলে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এবং বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় ভাণ্ডার দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। বিদেশি বিনিয়োগ যার মধ্যে প্রত্যক্ষ

বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) এবং প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠানগত বিনিয়োগ (FII) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা 1990-91 সালের $100 মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2014-15 সালে $73.5 বিলিয়ন হয়েছে। আবার 1990-91 সাল থেকে 2014-15 সালে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ভাণ্ডার প্রায় $6 বিলিয়ন থেকে বেড়ে প্রায় $321 বিলিয়ন দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের মধ্যে ভারত একটি বৃহত্তম বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় ভাণ্ডারের ধারক।

ভারতবর্ষকে একটি সফল রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে দেখা যেতে পারে কেননা ভারত সংস্কারকালীন সময়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাংশ, কারিগরি পণ্য, তথ্য প্রযুক্তি সফট্‌ওয়্যার এবং বস্ত্র রপ্তানি করত। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হয়েছিল।

অন্যদিকে সংস্কার প্রক্রিয়াটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল কারণ কর্মসংস্থান, কৃষি, শিল্প, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং ফিসক্যাল ব্যবস্থাপনার মতো ইত্যাদি বিশেষ ক্ষেত্রের মৌলিক সমস্যা যেগুলো আমাদের অর্থনীতি সম্মুখীন হচ্ছিল তাদের উপর আলোকপাত করা হয়নি।

বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান :

যদিও সংস্কারকালীন সময়ে GDP বৃদ্ধির হার বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে

কাজগুলো করো

- পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে তোমার নিশ্চই কৃষিক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তুকি সম্পর্কে পড়ে থাকবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষিজ শিল্পকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন করানোর জন্য তার উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেওয়া উচিত। তুমি কি উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে একমত? কীভাবে তা করা সম্ভব, শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।
- নীচে দেওয়া উদ্ধৃতিটি পড়ো এবং শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

  চিনাবাদাম অন্ধ্রপ্রদেশের একটি তৈলবীজ শস্য। মহাদেবন অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার একজন চাষি, যিনি 1500 টাকা ব্যয় করেন চিনাবাদামের চাষ করার জন্য আধা একর জমিতে। তার এই ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কাঁচামাল অর্থাৎ (বীজ সার ইত্যাদি) শ্রম, বলদ এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির খরচ। দেখা গেল, মহাদেবন মোটামুটি দুই কুইন্টাল চিনাবাদাম উৎপাদন করেন এবং তা 1000 টাকা মূল্যে বিক্রি করেন। এইভাবে মহাদেবন 1500 টাকা খরচ করে 2000 টাকা লাভ করেন। অনন্তপুর একটি খরাপ্রবণ অঞ্চল কিন্তু অর্থনৈতিক সংস্কার কালে এখানে সরকার কর্তৃক কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। তার উপর এখন অনন্তপুরে চিনাবাদাম শস্য উৎপাদন সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে কেন না ফসল রোগাক্রান্ত হয়েছে। অন্যদিকে গবেষণা এবং তার পরিব্যাপ্তিমূলক কাজ অনেক নীচে নেমে গিয়েছিল সরকারের আর্থিক সাহায্যের অভাবে। মহাদেবন এবং তার বন্ধুরা বিষয়টিকে বার বার বিভাগীয় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি অফিসারদের দৃষ্টিগোচর করার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। কিন্তু বীজ, সার ইত্যাদির উপর থেকে ভর্তুকি হ্রাস পাওয়ার ফলে মহাদেবনের চাষের ক্ষেত্রে ব্যয়ভার বেড়ে যায়। তার উপর আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর কোনরকম বাধা নিষেধ না থাকার ফলস্বরূপ, স্থানীয় বাজারগুলোতে সস্তায় আমদানিকৃত ভোজ্যতেলের চাহিদা মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। মহাদেবন বাজারে তার চিনাবাদাম বিক্রি করে কিন্তু তার উৎপাদন খরচ কোনোভাবেই উঠে আসছিল না।

  মহাদেবনের মতো এধরনের কৃষকদের সমস্যা কীভাবে নিরূপণ করা যেতে পারে? তা শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

সংস্কারকালীন বৃদ্ধির হার আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে কমসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। তুমি পরবর্তী এককে কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক এবং বৃদ্ধির মধ্যে একটি সংযোগ অধ্যয়ন করবে।

কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার :

সংস্কার কর্মসূচি কৃষিক্ষেত্রকে উপকৃত করতে সমর্থ হয়নি যার ফলে কৃষিতে বৃদ্ধি হারের গতি হ্রাস পেয়েছিল।

সংস্কারকালীন সময়ে কৃষিক্ষেত্রের পরিকাঠামোতে যেমন — জলসেচ, বিদ্যুৎ, সড়ক, বাজার সংযুক্তিকরণ ও গবেষণা এবং তার ব্যাপ্তিতে (যেটা সবুজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল) সরকারি বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছিল। অধিকন্তু, রাসায়নিক সারে ভর্তুকি তুলে নেওয়াতে উৎপাদনের ব্যয় বেড়ে গিয়েছিল, যা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এই ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক নীতি পরিবর্তনের যেমন কৃষিজাত দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক হ্রাস, ন্যূনতম সমর্থনমূল্যের প্রত্যাহার এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উপর পরিমাণগত হস্তক্ষেপ তুলে নেওয়ার মতো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল। ভারতীয় কৃষকদের যেহেতু বর্তমানে অধিকতর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাই এই সমস্ত নীতি পরিবর্তনগুলোই তাদের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলছে।

তাছাড়া, কৃষিক্ষেত্রে রপ্তানিকেন্দ্রিক নীতি কৌশল অবলম্বন করায় অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য উৎপাদন থেকে স্থানান্তরিত হয়ে উৎপাদকরা রপ্তানি বাজারের দিকে মনোনিবেশ করছে। যেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে অর্থকরী শস্যের উৎপাদনে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এটাই খাদ্যশস্যের দামের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

শিল্পক্ষেত্রে সংস্কার :

শিল্পের বৃদ্ধির হারেও ধীরগতি নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর কারণ হল শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার হ্রাস। এই হ্রাসের বিভিন্ন কারণগুলো হল সস্তায় আমদানি, পরিকাঠামোতে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ ইত্যাদি। বিশ্বায়নের যুগে উন্নয়নশীল দেশগুলো বাধ্য হয়ে তাদের অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে উন্নত দেশগুলো থেকে দ্রব্য এবং মূলধন আনার প্রবাহকে বাড়িয়ে দেয় এবং আমদানিকৃত দ্রব্যের দ্বারা উন্নয়নশীল দেশের শিল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সস্তা আমদানিকৃত দ্রব্য দেশীয় দ্রব্যের চাহিদার জায়গা দখল করে নেয়। দেশীয় নির্মাণকারীরা আমদানিকৃত দ্রব্যের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে থাকে। বিদ্যুতের যোগানসহ পরিকাঠামোগত সুবিধাগুলো পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাবে অপূর্ণ থেকে যায়। দ্রব্য এবং সেবার অবাধ চলাচলে বিশ্বায়ন শর্ত আরোপ করায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্থানীয় শিল্পগুলো এবং কর্মসংস্থানের সুযোগগুলো মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়।

তাছাড়া, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশ এখনো উন্নত দেশগুলোর বাজারে প্রবেশাধিকার পায়নি, কারণ উন্নত দেশগুলো উচ্চ শুল্কবিহীন বাধা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, যদিও ভারত বস্ত্র ও বয়নশিল্পের রপ্তানির উপর সকল প্রকার কোটা সংক্রান্ত হস্তক্ষেপ তুলে নিয়েছিল, কিন্তু আমেরিকা তাদের কোটা সংক্রান্ত হস্তক্ষেপ ভারত এবং চিন থেকে আমদানি করার ক্ষেত্রে দূর করেনি।

বিলগ্নিকরণ :

সরকার প্রতিবছর সরকারি ক্ষেত্রে উদ্যোগগুলোর (PSE) বিলগ্নিকরণের একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। উদাহরণ স্বরূপ 1991-92 সালে বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে 2500 কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল

সরকার সমর্থ হয়েছিল লক্ষ্যমাত্রা থেকে 3040 কোটি টাকা বেশি সংগ্রহ করতে। 2014-15 সালে

লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রায় 56 হাজার কোটি টাকা পক্ষান্তরে অর্জিত হয়েছে 34 হাজার 500 কোটি টাকা। সমালোচকরা ইঙ্গিত করেন যে BSE র সম্পাদকে অবমূল্যায়ন করে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। এর মানে দাঁড়ায় সরকারের প্রচুর ক্ষতি। উপরন্তু, বিলগ্নিকরণ থেকে প্রান্তিকে PSE বা সরকারি উদ্যোগগুলোর পুনর্জীবনের বা উন্নতিতে বা দেশের পরিকাঠামো নির্মাণে কাজে না লাগিয়ে সরকারের রাজস্ব খাতে ঘাটতি মেটাতে ব্যবহৃত হয়েছিল। তুমি কি এটা মনে কর যে সরকারি সংস্থার সম্পত্তি আংশিক বিক্রি করে দেওয়াটা তাদের কার্যকরী করে তোলার সর্বোত্তম পন্থা ?

সংস্কার এবং রাজস্ব নীতিসমূহ :

অর্থনৈতিক সংস্কার, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যয় বৃদ্ধি, বিশেষ করে সামাজিক ক্ষেত্রগুলোতে ব্যয়ের উপরে সীমারেখা টেনে দিয়েছে। সংস্কার চলাকালীন সময়ের কর ছাড়, যার উদ্দেশ্য ছিল রাজস্বখাতে আয় বৃদ্ধি করা এবং কর ফাঁকি প্রতিরোধ করা, সরকারের জন্য কর বাবদ রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়নি। এটাও উল্লেখ যে, সংস্কার কর্মসূচির অন্তর্গত মাসুল বা শুল্ক হ্রাসের ফলে আমদানি রপ্তানি শুল্কের সাহায্যে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সুযোগও কমে গেছে। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কর ছাড়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল যাতেকরে করখাতে রাজস্ব আয়বৃদ্ধির সুযোগ আরও কমে গেছে। এতে উন্নয়ন এবং কল্যাণকামী খাতে ব্যয়ের উপরে এক বিরূপ প্রভাব তৈরি হয়েছে।

3.7 উপসংহার

উদারনীতি এবং ব্যক্তি মালিকানাকে উৎসাহিত করার নীতির মাধ্যমে বিশ্বায়নের যে প্রক্রিয়া তা ভারতে এবং অন্যান্য দেশ উভয় ক্ষেত্রেই ধণাত্মক এবং ঋণাত্মক (সুফল এবং কুফল) দুইয়েরেই জন্ম দিয়েছে। কিছু কিছু পণ্ডিত এই যুক্তি দেখান যে বিশ্বায়নকে বিশ্ব বাজারসমূহ উন্নত প্রযুক্তি প্রাপ্তির একটা সুযোগ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর বড়ো শিল্পগুলোর সামনে আন্তর্জাতিক অঙ্গানে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগী হয়ে উঠার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা হিসাবে দেখা উচিত।

বাক্স 3.3 : সারিসিল্লরে শোকাবহ ঘটনা !

ভারতের অনেক রাজ্যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সংস্কার নীতি ভর্তুকি এবং কম দামে বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থার ইতি ঘটায় এবং বিদ্যুৎ শুল্কের অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি ঘটায়। এতে ক্ষুদ্র শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের বিদ্যুৎচালিত তাঁত বস্ত্রশিল্প এরকমই একটি উদাহরণ। যেহেতু বিদ্যুৎচালিত তাঁত শ্রমিকদের বেতনাদি কাপড়ের উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেহেতু বিদ্যুৎ ছাঁটাই মানে সেই সমস্ত তাঁত শ্রমিকদের, যারা এমনিতেই উচ্চ বিদ্যুৎ শুল্কহারে জর্জরিত ছিল, তাদের বেতন বা পারিশ্রমিক হ্রাস বোঝায়। এতে এই সমস্ত তাঁত শ্রমিকদের জীবন জীবিকার উপরে এক বিপর্যয় নেমে আসে এবং এর ফলশ্রুতিতে 'সারিসিল্লা' নামক অন্ধ্রপ্রদেশের একটি ছোট নগরীতে 50 জন বিদ্যুৎচালিত তাঁতশ্রমিক আত্মহত্যা করেন।

- ➢ তুমি কি এটা মনে কর যে বিদ্যুৎ শুল্ক বৃদ্ধি করা উচিত নয় ?
- ➢ সংস্কারে ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোর পুনঃজীবনে তোমার প্রস্তাব কী হবে ?

উল্‌টোদিকে সমালোচকরা এই যুক্তি দেখান যে বিশ্বায়ন হচ্ছে উন্নত দেশগুলোর অন্যান্য দেশে নিজেদের বাজার বিস্তার করার পদ্ধতি বা পরিকল্পনা তাদের কথা অনুযায়ী এটা গরিবদেশগুলোর নাগরিকদের কল্যাণ এবং তাদের আত্মপরিচয়ের সাথে এক সমঝোতা স্বরূপ। আরও বাড়িয়ে বলতে গেলে বাজার চালিত বিশ্বায়ন রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরও তীব্র করেছে।

ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে কিছু স ংখ্যক চর্চায় বা অধ্যয়নে এটা বলা হয়েছে 1990 এর প্রারম্ভিক লগ্নে যে সংকটের উৎপত্তি হয়েছিল তা মূলত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত অসাম্য এবং সরকারি উদ্যোগে নেওয়া সংকট মোকাবেলায় অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি সমূহের কারণে, অসাম্যের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছিল এইসব বহিঃনির্দেশিত নীতিগুচ্ছ শুধুমাত্র উচ্চ আয় শ্রেণির মানুষের আয় এবং ভোগের মান বৃদ্ধি করেছিল এবং বৃদ্ধিসীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র পরিসেবা ক্ষেত্রের কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন টেলিযোগাযোগ তথ্য প্রযুক্তি, অর্থ, বিনোদন, ভ্রমণ এবং আথিথেয়তা সেবা, ভূ-সম্পত্তি এবং বাণিজ্য পরিসেবা ইত্যাদিতে অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেমন কৃষিশিল্প ইত্যাদি, যা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সেগুলো এর বাহিরে ছিল বা উপেক্ষিত ছিল।

সংক্ষিপ্ত বৃত্তি

- অর্থনীতি, বিদেশি মুদ্রার সংকট, বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গাতিবিহীন আমদানির বিকাশ এবং উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির হারের মতো সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। ভারত তার অর্থনৈতিক নীতি 1991 সালে পরিবর্তন করেছিল এবং বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার চাপের কাছে নতি স্বীকার করে।
- অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে, শিল্প এবং আর্থিক ক্ষেত্রে বড়োমাপের সংস্কার প্রক্রিয়া সূচনা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে বিদেশি মুদ্রার বিনিময়ে বিনিয়ন্ত্রণ এবং আমদানি ক্ষেত্রে উদারনীতির মতো সংস্কারগুলো চালু হয়েছিল।
- সার্বজনিক ক্ষেত্রগুলোর পরিসেবার মান উন্নত করতে এদের ভূমিকাকে হ্রাস করা এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের কাছে এদের দরজা খুলে দেওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য সাধিত হয়েছিল। এটা করা হয়েছিল বিলগ্নিকরণ এবং উদারীকরণের মাধ্যমে।
- বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া হচ্ছে উদারীকরণ এবং বেসরকারিকরণ নীতিসমূহের পরিণতি। এর মানে হচ্ছে দেশীয় অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে একত্রীকরণ করা।
- আউট সোর্সিং বা কাজের বহিঃউৎসরণ প্রক্রিয়া একটি দ্রুত উঠে আসা ব্যবসায়িক কার্যকলাপ।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) লক্ষ্য হচ্ছে একটি নিয়মতান্ত্রিক বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রচলন বা প্রতিষ্ঠা করা যার মাধ্যমে বিশ্ব সম্পদের সুষ্ঠু সর্বোৎকৃস্ট ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায়।
- সংস্কারকালীন সময়ে, কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রের বৃদ্ধি নিম্নগামী হয়ে পড়ে কিন্তু পরিসেবা ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঊর্ধ্বমুখী ছিল।
- সংস্কার প্রক্রিয়া থেকে কৃষিক্ষেত্র লাভবান হয়নি। সার্বজনিক বিনিয়োগও এই ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছিল।
- আমদানিকৃত দ্রব্য সস্তায় মিলে যাওয়ায় এবং নিম্নহারে বিনিয়োগের কারণে শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধিও শ্লথ হয়ে পরেছিল।